বাকৃবির অবক্ষয়-নৈরাজ্য

ড. শেখ জিনাত আলী, ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন, প্র. ড. শাহ-ই-আলম, ড. শঙ্কর কুমার রাহা, ড. মো. মঞ্জুরুল আলম এবং আতিয়ার রহমান মোল্লা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বাংলাদেশের তৃতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর লে. জে. আজম খান জারিকৃত অধ্যাদেশ বলে ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। এ অধ্যাদেশ একটি কালো বিশ্ববিদ্যালয় আইন, যা বাতিল করে ১৯৭৩ এর ন্যায় গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ এই জারির দাবি জানিয়ে আসছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এ অধ্যাদেশ দ্বারাই বাকৃবি এখনও শাসিত হচ্ছে। যা হোক, আজ দেশ জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিগত বছরগুলোতে কৃত সীমাহীন দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বেচ্ছাচারিতা, নৈরাজ্য ও অপশাসনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে একটি সুষ্ঠু, সুবাধ, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু কর্মকাণ্ড জনমনে স্বস্তির সুবাতাস সৃষ্টি করছে এবং মানুষ সরকারের প্রতি আশাবাদী হয়ে উঠছে। এমন একটি পরিস্থিতিতে বাকৃবিতে বিগত ৫-৬ বছরে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগে যে নিয়মনীতি বহির্ভূত, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গের পুনর্বাসনসহ নিয়োগ বাণিজ্য করা হয়েছে তার কিছু নজির এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বর্তমানে বাকৃবিতে ৫৪৩ জন শিক্ষক রয়েছে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা এখন ২ হাজার ২৩৯ জন। ছাত্রসংখ্যা (জানুয়ারি-জুন '০৭ সেমিস্টারসহ) ৫ হাজার ৭২১ জন। জন্মলগ্ন থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের যে নীতি-নৈতিকতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুসরে অবলম্বন করা হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে তার কোন কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের স্ট্যাটুটস-এ ১৫/২ ধারায় শিক্ষকদের কর্তব্যের একটি পরিমাণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী একজন শিক্ষকের ৩৬ সপ্তাহের এক শিক্ষাবর্ষে মোট প্রায় ১ হাজার ৫০০ ঘণ্টা কাজ করার বিধান বিদ্যমান। ধারাটি এ রকম 'The work-load of the teachers and the distribution of work-schedule for the various duties mentioned in clauses (a), (b) and (c) paragraph (i) during and academic year of approximately thirty-six weeks, shall normally total about 1500) hours'. এই ধারা মোতাবেক প্রতিটি অনুষদের শিক্ষা বিভাগগুলোতে কত সংখ্যক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা সম্ভব তা চিহ্নিত করা হয়েছে। উপরোক্ত সংখ্যা সূত্রে শিক্ষকছাত্র অনুপাত বর্তমানে দাঁড়ায় ১:১০.৫, আর ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীর অনুপাত ১:২.৫৮। 'বিশ্ববিদ্যালয় ডায়রিতে (০৭) প্রদত্ত শিক্ষক সংখ্যার মধ্যে ২১৬ জনই নিয়োগ করা হয়েছে গত ৫-৬ বছরে এবং এখন এরা কেউ সহকারী অধ্যাপক স্তরের কেউ প্রভাষক। এদের অনেকেই এখন বিদেশে উচ্চ শিক্ষারত। প্রভাষক ও সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকছাত্র সংবিধিতে প্রথম পদ হচ্ছে প্রবেশ পদ। কোন শিক্ষা বিভাগে কত শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা যায় তার ভিত্তি উপরে অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয়ত প্রভাষক পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলর ডিগ্রি করা হয়েছে যেহেতু ব্যাচেলর ডিগ্রি স্থলাভিষিক্ত টেকনিক্যাল ডিগ্রি। কিন্তু শিক্ষকতার উৎকর্ষের স্বার্থে প্রান্তিক টেকনিক্যাল ডিগ্রি যথেষ্ট নয় বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক পদে ব্যাচেলর ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দিয়ে অল্প টাকা খরচ করে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) তৎকালীন চুক্তি মোতাবেক মাস্টার ডিগ্রি (এম এস) বা ক্ষেত্র বিশেষে পিএইচডি অর্জনের জন্য পাঠানো হতো। এর প্রধান কারণ তখন বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগে মাস্টার ও পিএইচডি প্রদানে ভৌত ও অন্য সুযোগ ছিল না। কিন্তু ঘটের দশকের মাঝামাঝি সময় অনেক শিক্ষা বিভাগে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স শুরু হয়ে যায়। তারপর দেখা গেল প্রভাষক পদে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রিকে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হলো এবং এর ফলে আশির দশক অবধি যেসব প্রভাষক নিয়োজিত হলো তারা বেশ উৎকর্ষ নিয়েই শিক্ষণ কাজে অবদান রাখল এবং প্রভাষক পদগুলো ওপরে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ধারা অনুসারে শিক্ষাদান কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাকৃবির মাস্টারপ্ল্যানের (১৯৬৫-৭৫) উল্লেখ করতে হয় যেখানে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার পরিমাণসহ শিক্ষক পদের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় শিক্ষকছাত্র অনুপাত ধরা হয় ১:১০।

অতঃপর ১৯৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও উপরোক্ত দলিলের সিলেকশন নিয়োগনীতি অনুসারে শিক্ষক নিয়োগের কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয় এবং এর ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-গবেষণা কাজে কিছু গতিশীলতা অর্জিত হতে থাকে। কিন্তু বিগত ৫-৬ বছরে বিশেষভাবে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে পূর্বের সব নিয়মনীতি বিসর্জন দিয়ে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি এমন পর্যায়ে আনয়ন করা হয়েছে ভয়াবহভাবে যা থেকে বাকৃবি বাদ যাওয়ার কথা নয়। এখানে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতি, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, নৈরাজ্য-অবক্ষয় ও ক্রমাবনতির নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি আংশিক প্রতিবেদন দৈনিক 'প্রথম আলো' (২৮ মার্চ '০৭) প্রকাশ করেছে। বাকৃবিতে প্রশাসনিক নৈরাজ্য, শিক্ষকদের মধ্যে অনৈতিক বিভাজন ও মাস্টাররোল শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাগমের প্রথম সূত্রপাতটি করেন ২০০০ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী শাসনামলের শেষ উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ারুল ইসলাম। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষাবলম্বী শিক্ষকরা নির্দলীয়ভাবে জিতে আসছে '৭৫ পরবর্তী পাকিস্তানপন্থি পটপরিবর্তনের পরও '৯০ সাল অবধি। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হলে শিক্ষক নিয়োগে নির্লজ্জ দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগের যে অনৈতিক বেহিসেবী নিয়োগ বাণিজ্য চালায় উপাচার্যরা তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি অবারিত হয়েছে। এই ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী শিক্ষকরা (প্রভাষকরা) একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রির ছাত্রছাত্রী এবং ২ বছরের শিক্ষানবিশ। এদের নিয়ে ব্যবহারিক ক্লাসে ছাত্র হাজিরা রেকর্ড করা ছাড়া অন্য কিছু শিক্ষণ কাজ করানো অসম্ভব। এদের শিক্ষক নিয়োগে প্রথমত দলভারি করার কাজটি শিক্ষকদের বিএনপি-জামায়াত অনুসারী সোনালী দল অতি দ্রুততার সঙ্গে করে যাচ্ছে, দ্বিতীয়ত : জনপ্রতি ২০৩ লাখ টাকা হাওয়া ভবনের নিয়ন্ত্রণে অন্যায় অর্জন দিয়ে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে জয়লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জনপ্রতি রয়েছে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এ নিয়োগ বাণিজ্যে অংশ নেয়। তা ছাড়া, স্থানীয় সিন্ডিকেট সদস্যরাও (সংসদ সদস্য) এসব নিয়োগ বাণিজ্যে অংশ নেয়। উল্লেখ্য, সরকারের ৩০ ভাগ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের যোগ্যতা সাপেক্ষে নিয়োগ দেয়ার নীতি বহাল থাকা সত্ত্বেও প্রভাষক নিয়োগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তা মানা হয় না। শোনা যায় প্রফেসর মু. মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. মো. আমিরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. আবদুল হালিম খান, প্রফেসর ড. এএম ফারুক, প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসেন মিঞা, প্রফেসর ড. মু. ওয়াহিদ-উ-জামান, প্রফেসর ড. মো. মোতাহার হোসেন মণ্ডল, প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম সরকার, প্রফেসর ড. ইকবাল হোসেন সবাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সবাই দলীয়ভাবে অনুগত্য ও লাখ লাখ টাকা নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে [illegible] আমলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ পেয়েছেন। এদের যথাযথ আইনের আওতায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে নিয়োগ বাণিজ্যের বিষয়টি জানা যাবে বলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করেন। একমাত্র প্রফেসর মু মুস্তাফিজুর রহমান ও প্রফেসর ড. আমিরুল ইসলামের কর্মকালে ৮৯ জন কর্মকর্তা (দলীয় ক্যাডার) বিভিন্ন সেকশনে/বিভাগে (ডেপুটি রেজিস্ট্রার হতে সেকশন অফিসার পর্যায়ে) নিয়োগ হয়েছে, যাদের মধ্যে ছাত্রহত্যার চার্জশিটভুক্ত আসামিও রয়েছে এবং তাদের শিক্ষাগত ও কর্মযোগ্যতা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে নেমে এসেছে উৎকর্ষের পরিবর্তে স্থবিরতা, সততার পরিবর্তে শঠতা ও সমন্বয়হীনতা। উল্লেখ্য, ৬০ বছর বয়স পূর্তি হওয়ার পর কোন শিক্ষক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন আইন অনুযায়ী না করতে পারলেও প্রফেসর মু. মুস্তাফিজুর রহমান ৭ দিন (জুলাই ২০০৩) এবং প্রফেসর ড. আমিরুল ইসলাম (জুলাই ২০০৬ থেকে) প্রায় ২ মাস উপাচার্যের দায়িত্ব অব্যাহত রাখেন। সরকার প্রফেসর ড. আমিরুল ইসলামের ২ মাস উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বলে গণ্য হবে মর্মে আদেশে উল্লেখ করেছেন, যা বেআইনি।

কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে জনবল কাঠামোর পরিবর্তে মনগড়া গোপন কাঠামো কাজ করেছে। কর্মচারী সমিতির নেতারা (ইদ্রিস, বারী, জয়নাল, লিয়াকত) নিয়োগ বাণিজ্য করে লাখ লাখ টাকার মালিক হয়েছে ও কেউ আবার বাগানবাড়ি তৈরি করেছে। অথচ বিশাল এ সমিতি সরকারের রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের কাছে রেজিস্ট্রার্ড নয় একেবারে ঘোড়া ছাড়া থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এ বেআইনি সমিতিকে স্বীকৃতি দিয়ে কাজ করতে দেয়। সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন এ কর্মচারী সমিতির মধ্যে নেই। অতীতে ২/১ বার এ কর্মচারীরা ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং একজন ছাত্রের মর্মান্তিক প্রাণহানি হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে কিছু গবেষণামূলক প্রদর্শন খামার রয়েছে এবং খামারে এই শ্রমিক-কর্মচারীরা নিয়োজিত থাকলেও এদের প্রশাসন ক্ষেত্রে বিশেষে ব্যবহার করে নিজ স্বার্থে। মজার ব্যাপার হলো এসব শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ হয় প্রশাসন থেকে সরাসরি। এসব খামারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা নিয়ে তদন্ত হতে পারে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি ছাত্রী হলসহ মোট হলের সংখ্যা ১১টি। একমাত্র ছাত্রী হলের আবাসনে সিট বণ্টনে কোন সমস্যার কথা জানা যায়নি; কিন্তু অন্য ৯টি হলে ছাত্র আবাসনে সিট বণ্টনে কোন শৃঙ্খলা এখন নেই, ক্ষমতাধর ছাত্র সংগঠন অন্য ছাত্রদের ওপর শারীরিক নির্যাতনসহ সিট বাণিজ্য করে এবং হল প্রশাসনে তৎকালীন দলীয় অনুসারী শিক্ষকরা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষক নিয়োগ পায়নি। ফলে এসব অপকর্ম অবাধে চলে। পূর্ববৎ এখানে সবাই বহাল তবিয়তে। দেশের মধ্যে যে পরিবর্তন বা দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চলছে তার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগেনি।

সংবাদ
তারিখ 27 APR 2007
পৃষ্ঠা ৭